প্রতিধ্বনি ২০১৮

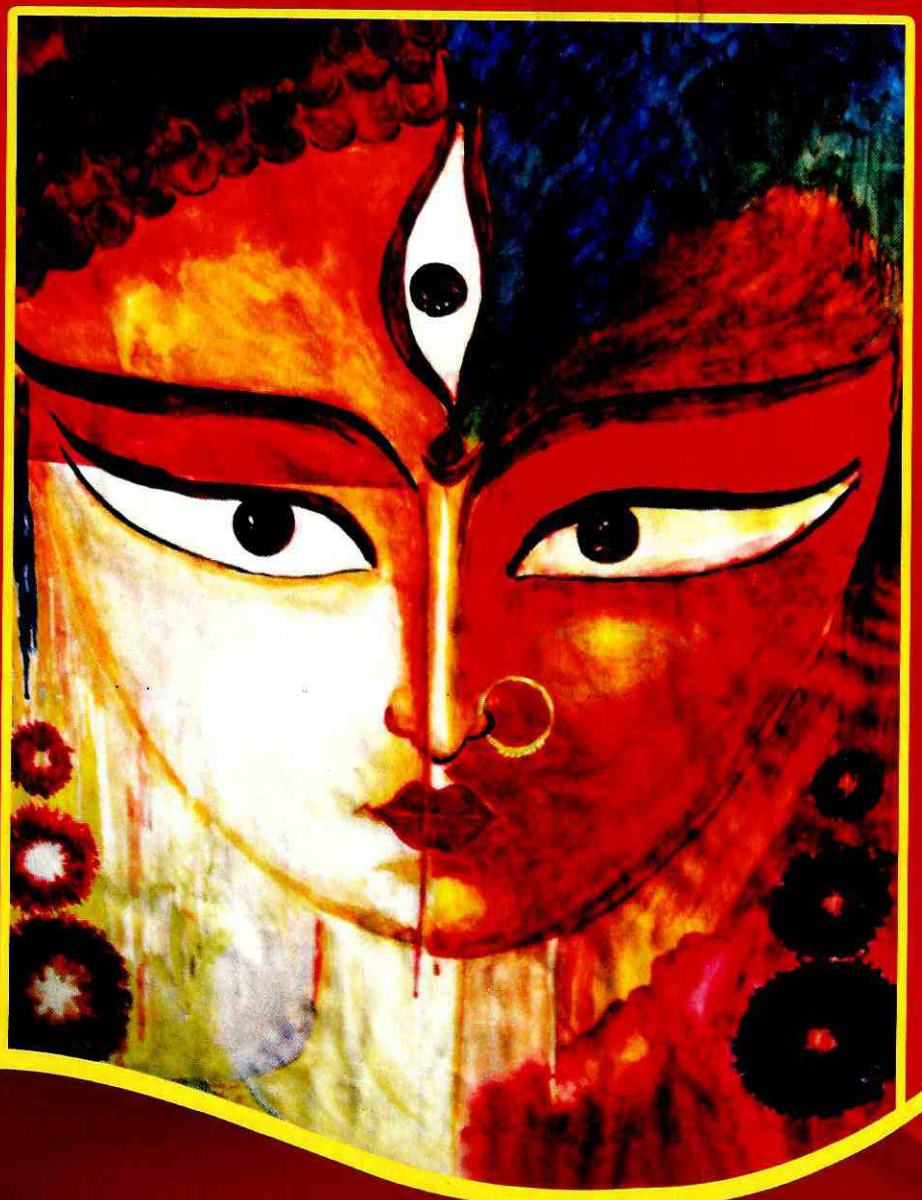

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়, মালিগাঁও, গুয়াহাটী

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ২০১৩

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ২০১৩

L.C.B. COLLEGE LIBRARY

শুভেচ্ছা বাণী

এখন সমাজৰ বৌদ্ধিক তথা সাংস্কৃতিক বিকাশত আলোচনী এখনৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ আলোচনী 'প্রতিধ্বনি' দশম সংখ্যা প্ৰকাশৰ আয়োজন কৰা বুলি জানিব পাৰি সন্তোষ পোৱাৰ লগতে গৌৰববোধো কৰিছো। এই আলোচনীখনৰ জৰিয়তে বিভাগৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিকৰ্ম বিকাশৰ লগতে সমাজৰ বৌদ্ধিক জগতলৈ অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিলো।

ড° নিশিকান্ত ডেকা
অধ্যক্ষ
ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুৱাহাটী

প্রতিধ্বনি
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী - ৭৮১০১১

দশম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১৪

ডি.টি.পি. ঃ শিবানী দে
সূর্যসেন দেব
করেন তালুকদার

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ রূপান্বিতা চৌধুরী

মুদ্রণ ঃ চৌধুরী এসোসিয়েটস, ভরলুমুখ, গুয়াহাটী - ৭৮১০০৯
দূরভাষ ঃ ৯৮৬৪০-৭৯৮৪৫

L.C.B. COLLEGE LIBRARY
MALIGAON, GHY
Date.........

সম্পাদকীয়

..........সময় এগিয়ে চলছে, বছর গড়িয়ে আবার 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশের সময় এসে গেছে। ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'প্রতিধ্বনি'র দশম সংখ্যা প্রকাশের পথে। সেই ২০০৩ সালে এর যাত্রা শুরু হয়েছে, এখনও সেই যাত্রা অব্যাহত। সাহিত্য সৃষ্টি যেহেতু অবিরাম, তাই এই যাত্রাও অবিরাম। আজকের Computer, Internet তথা বিশ্বায়নের যুগেও সাহিত্য যে তার মূল্য হারিয়ে ফেলেনি এর প্রমাণ রেখে যায় বৎসর বৎসর ধরে অনুষ্ঠিত হতে থাকা বই মেলা গুলো। এই হিসাবে সাহিত্যের ধারা অব্যাহত, আমাদের বিভাগের পত্রিকার যাত্রাও অব্যাহত। ছোট ছোট পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই সকল লেখক-লেখিকা, কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্য জীবন শুরু করেন এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল তারা হয়ে ফোটে ওঠেন। আমাদের বিভাগের পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের এই প্রয়াস, যেন যারা লেখে অথচ ছাপাতে সংকোচ করে, সেইসকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভাকে লোকসমক্ষে তুলে আনার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্টি কর্মে উৎসাহিত করা তথা মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলাই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। এই সুযোগে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড০ নিশিকান্ত ডেকা মহাশয়কে তার সহযোগিতার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। মহাবিদ্যালয়ের যেসকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দ তাদের লেখনী দিয়ে 'প্রতিধ্বনি'কে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশের কাজে বিভিন্ন ভাবে সহায়-সহযোগিতা করার জন্য বিভাগের অধ্যাপক সূর্য্যসেন দেবকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীকেও এই সুযোগে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সবশেষে ছাপার কাজের জন্য অরূপ কুমার চৌধুরী, করেন তালুকদার ও প্রবীন চন্দ্র দাসকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতি বছর 'প্রতিধ্বনি' প্রকাশ করে বাংলা বিভাগ তথা মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করার প্রতিশ্রুতি সহ ইতি-

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ
ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ঃ

একটি ঐতিহাসিক বৃক্ষের আত্মকথা	রঞ্জনা সেন	১
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ঃ একটি আলোচনা	হীরাবালা দাস	৪
বাংলা ও চাকমা লোককথার তুলনামূলক পাঠ	সূর্যসেন দেব	৫
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হাস্যরস	অসীম দাস	১৩
'সংস্কার' গল্প ঃ একটি বিশ্লেষণ	শিবানী দে	১৭

গল্প ঃ

প্ল্যানচেট	সৌমাঞ্জলি বাগচি	২৩

কবিতা ঃ

ক্রন্দন রোধের ক্রন্দন	নীলিমা গোস্বামী শর্মা	২৫
কাগজ পেলেই কবিতা লিখতে পারিনা	নীলিমা গোস্বামী শর্মা	২৫
বিচিত্র নগরী	পমী দে	২৬
শরতের আকাশ	চন্দ্রমোহন কলিতা	২৬
শাওন	আবুল কাসেম তপাদার	২৭
মায়ের মন	শিবানী দে	২৮
পাখির কথা	মমতা দাস	২৯
প্রণাম জানাই	সীমা দে	২৯
জান কি?		৩০
লেখক পরিচিতি		৩১
বিভাগীয় সংবাদ ২০১৩		৩২

একটি ঐতিহাসিক বৃক্ষের আত্মকথা

- রঞ্জনা সেন

আমি একটি আম গাছ। শাখা-প্রশাখা মেলে দীর্ঘদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছি। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে জীবনে কত ঘটনাই দেখলাম। আজ আমার গোড়ায় কুড়ুলের লাগাম ছাড়া নির্মম আঘাত পড়ছে। শরীরটা কেঁপে উঠছে বারবার। আজ আমি ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু আমি তো কোনদিন কারো ক্ষতি করিনি। কত কিশোর আমার ছায়ায়, আমার ডালে খেলে যুবক হয়েছে, তাদের ভালোবেসে আমি ফল দিয়েছি, কত পাখি আমার ডালে বাসা বেঁধেছে, কত পাখির শাবক আমার স্নেহে বড় হয়েছে, ক্লান্ত পথিক আমার ছায়ায় এসে প্রাণ জুড়িয়েছে, আমি মাটি থেকে জল শুষে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি.... বাতাস শীতল হয়েছে, আমি বর্ষা ডেকে এনেছি আর সেই বর্ষার জলে নিজে স্নান করেছি।

আমার পাশেই ছিল একটি ঘাট বাঁধানো পুকুর। সেখানে বহুলোকের সমাগম হতো। কেউ জল নিতে আসত, কেউ বা আসত স্নান করতে। পুকুরের পাশে ছিল একটা দালানবাড়ী। শুনেছিলাম এটা ছিল কোন এক জমিদারের বাগানবাড়ী। জমজমাট বাড়ীটাতে সারা বছরই এটা-ওটা উৎসব লেগে থাকতো, নাচ-গানের আসরও বসতো, আমিও তার অংশীদার হতাম। নাচের ছন্দে, গানের ছন্দে আমিও পুলকিত হয়ে উঠতাম। এখন আর সেই জৌলস নেই। দরজা জানালা বলতে আর কিছুই নেই। বয়সের ভারে সিড়িগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে এই বাড়ী হয়ে উঠলো বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে চলতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত আলাপ আলোচনা আর আমার ছায়ায় বসে চলতো বন্দুকের অনুশীলন। কিন্তু কোনো ভাবে পুলিশের নজরে এলো এই বাড়িটি। পুলিশের হানায় এক গভীর রাতে ধরা পড়লেন বেশ কয়েকজন বিপ্লবী। তারপর থেকেই বহুদিন ধরে আমি আর পুরণো বাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছি একা একা।

অনেক দিন পার হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন দেখলাম পুরণো বাড়ীটিতে বহু লোকের সমাগম। জানতে পারলাম ভারতমাতা দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হয়েছেন। ভিটেমাটি হারিয়ে প্রাণের ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এপার বাংলার মানুষ ছুটছেন ওপার বাংলায়, ওপার বাংলার মানুষ ছুটছেন এপার বাংলায়। তখন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম এ কোন স্বাধীনতা? স্বাধীনতা যে এতো বড় দুঃখ টেনে আনবে তা দুঃস্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারিনি।

ক্ষুদিরাম, বিনয়, বাদল, দীনেশের আত্মবলিদান কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে গেল?

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি অসহায় মানুষগুলোর দিকে। আমার সুখ দুঃখের সাথী ভাঙাচোরা বাড়িটিতে এসে ঠাঁই নিলেন বহু মানুষ। শুনলাম সরকারি ক্যাম্পে ওদের জায়গা হয়নি। সব হারানো মানুষগুলির দুঃখ-কষ্টের নীরব সাক্ষী আমি।

ধীরে ধীরে আবার সবাই চলে গেলেন। আমি আর আমার সাথী বাগানবাড়ি ফের একা। দুজন শুধু দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকদিন পর দেখলাম আমার প্রতিবেশী পুকুরটাকে কারা যেন মাটি দিয়ে ভরাট করছে। ভাবলাম যারা প্রতিদিন ওখানে স্নান করতেন, যারা প্রতিদিন ওখানে জল আনতে যেতেন, যে পাখিরা আমার ডালে বাসা বেঁধে ছিল আর পুকুরের জল খেত তারা এখন কোথায় যাবে?

বুঝতে পারিনি তখনও যে আমার সুখ-দুঃখের সাথী- সেই জমিদারের বাড়িটাও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং আমার অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। আমার শরীরেও কুড়ুলের আঘাত পড়ল। বার বার কেঁপে উঠলাম। আমাকেও তাহলে এবার চলে যেতে হ'বে? ঈশ্বর একটি অম্লান সুন্দর পৃথিবীতে আমাকে প্রেরণ করেছিলেন। কত আনন্দে ছিলাম, সবার কথা ভেবেছি এতদিন। বিশুদ্ধ বাতাস, বিশুদ্ধ জল প্রদান করে মানব জাতিকে জৈবিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছি। খুব দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, তোমরা আমাকে ধ্বংস করতে উঠে পরে লেগেছো। জানো কত পুরনো আমার শরীর, মাটির কত গভীরে আমার শিকড়, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? হল কিন্তু তাই। কোলাহলের মধ্যে আমার

যন্ত্রনা, কান্না হারিয়ে গেল, জমিদারের বাড়িটা হারিয়ে গেল বহুতলের ভিড়ে। সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পরও আমি কিন্তু রেহাই পেলাম না। আজ আমি শত খণ্ডিত হয়ে বহুতলের জানালা আর দরজা হয়ে পড়ে আছি। কেঁদে কেঁদে ফেরে আমার মন। আমি কিন্তু হারিয়ে গিয়েও হারিয়ে যাইনি। বছর কয়েক আগে চন্দন নগরের মহিলা সমিতির রাজ্য সম্মিলন হয়েছিল। সেখানে ছবির একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। সেখানে দেখলাম একদা বিপ্লবীদের গোপন ডেরা, আমার সুখ-দুঃখের সাথী জমিদারের বাড়ির ছবিতে আমিও রয়েছি। গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল। শত-খণ্ডিত হয়েও আমি মরিনি। আমি যেন এখনও শুনতে পাই গভীর রাতে ভাঙা সিঁড়ির কোঠায় বসে বিপ্লবীদের আলোচনা আর ভাঙা বাড়িতে তাদের পদচারনার শব্দ। ....

❖❖❖

L.C.B. COLLEGE LIBRARY
Date
GHY-11

মজার ধাঁধাঁ

১। দাঁত আছে কামড়ায় না, কালো ঘাস পেলে থামে না।

২। জন্ম থেকে বৃদ্ধ সে, বড় প্রয়োজনীয় যে।

৩। নাড়ী লিভার নাই তার বড় পেট আছে,
দাঁত জিহ্বা নাই তার বড় মুখ আছে।

৪। মাটির উপরে গা ছ, তার উপর ফল,
ফলের উপরে গাছ, কি উত্তর হবে বল ।

(উত্তর ৩১ পাতায়)

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ঃ একটি আলোচনা

- হীরাবালা দাস

বাংলা সাহিত্য তথা আধুনিক যুগের একজন উদীয়মান সাহিত্যিক হলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।বাল্যকালে তার মা-বাবা তাকে পশুপতি নামে ডাকতেন, কিন্তু তার এ নাম ভালো লাগতো না।বাল্যকাল থেকে পরিণতবয়স পর্যন্ত তার মধ্যে একটা শিশুসুলভ ভাব বিরাজ করতো। তার নাম পরিবর্তনের জন্য প্রায়দিন তিনি স্কুল থেকে এসে মা-বাবার সংগে ঝগড়া করতেন। যাই হোক, মেট্রিক পরীক্ষার পর তিনি সব কাজে সন্দীপন নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন তবে পশুপতি নামটিও মাঝে মধ্যে শোনা যেত। চিরকাল অসুখ-ভীরু সন্দীপন রোগকে ভয় পেতেন, বন্ধুদের সামনে প্রায়ই রোগের প্রতি থাকা ভয়ের কথা বলতেন। অবশেষে মারণব্যাধি কেন্সার রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স বিরাশী, সাল ২০০৫।

কেন্সার আক্রান্ত কবি জীবনে কখনও হার মানেননি। লেখার মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন কঠোর বাস্তব জীবনের সংগে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার ক্ষমতা ও প্রেরণা। তাই আমৃত্যু তিনি একটানা লিখে গিয়েছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন গভীর মনের সৃষ্টিশীল ও প্রতিভাবান লেখক যিনি সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও চিন্তাশীলতাযুক্ত সাহিত্য রচনা করে পাঠক সমাজের হৃদয় স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রচারবিমুখ সাহিত্যিক, এর ফলে লেখক হিসাবে তিনি যতটুকু সমাদর লাভ করেছিলেন তারচেয়ে বেশী সমাদর লাভ করেছিলেন একজন রসিক ব্যক্তি হিসাবে ।

সাহিত্যিক সন্দীপনের ১৯৬১ সালে রচনা করেন 'ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী' গ্রন্থটি। এটি ছাড়াও তিনি আরো অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এর কয়েকটি হলো, কথা সব আমি জানি, শৈশব, দিনরাত্রি, হিরোসিমা, মাই লাভ, কুকুর সম্পর্কে দুটো একটা কথা, অস্তিত্ব, অতিথি তুমি, এসো নীপবনে ইত্যাদি। তাঁর রচিত যে গ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছিলেন, সেই গ্রন্থটি হলো 'আমি ও বনবিহারী'। সন্দীপন সাহিত্য জগতে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন এর পেছনে রয়েছে তাঁর মনের বলিষ্ঠ একাগ্রতা আর আত্মবিশ্বাস। শুধু লেখকই নন, অন্যতম একজন ভাষা শিল্পী হিসাবেও তিনি খ্যাত ছিলেন।

Date.......... GHY-11

বাংলা ও চাকমা লোককথার একটি তুলনামূলক পাঠ

- সূর্যসেন দেব

বাংলার তৃতীয় ভুবন হিসেবে খ্যাত বরাক উপত্যকা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত। ধর্মের দিক থেকে এ উপত্যকায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান এবং ভাষার দিক থেকে বাঙালি, হিন্দি, ভোজপুরি, অসমিয়া, মণিপুরি, নেপালি ইত্যাদি ভাষা-ভাষী লোকের বসবাস। এছাড়াও রয়েছে নাগা, ডিমাছা, মার, কুকি, চাকমা, খাসিয়া, মুণ্ডা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর বসবাস। ফলে বরাক উপত্যকা মিশ্র সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং ভাষিকগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভাতৃত্ব এ উপত্যকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ফলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্যে তুলনামূলক পাঠ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা লোকসাহিত্য কোনও ভৌগোলিক সীমা বা পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বহুসূত্রে বা বহুমাধ্যমে যাযাবর মানুষের মতো লোকসাহিত্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভ্রমণ করে এবং সেই অঞ্চল বা পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে একই ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। মূল বিষয় একই থাকে, শুধুমাত্র চরিত্র, ঘটনা পরিবেশ এবং পরিবেশন রীতিটি পাল্টে যায়। বরাক উপত্যকায়ও দেখা যায় একই ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচলিত। একটি বাংলা ও চাকমা লোককথার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

গল্প বলা ও গল্প শুনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যেখানেই মানুষের বসবাস সেখানেই লোককথার প্রচলন। পৃথিবীর সবদেশের মতো বরাক উপত্যকার লোকসাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য উপাদান লোককথা। বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথাগুলির মধ্যে পাই -

১) ব্রতকথা
২) রূপকথা
৩) হাস্যরসাত্মক লোককথা
৪) সতীনদ্বন্দ্বমূলক লোককথা
৫) স্থান-নাম উৎস সম্পর্কিত লোককথা
৬) পশুকথা
৭) ভূতপ্রেত ও রাক্ষসের কাহিনি
৮) বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতামূলক কাহিনি
৯) মন্ত্র-তন্ত্রমূলক লোককথা
১০) চালাক এবং বোকার কাহিনি
১১) প্রবাদ ও নীতিকথামূলক কাহিনি
১২) ধাঁধামূলক লোককাহিনি
১৩) ঘটনাচক্রে সৌভাগ্যের উদয় ও পুরস্কার লাভের কাহিনি ইত্যাদি

বাঙালি এবং চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত শেষোক্ত বিষয়ের একটি লোককথার তুলনামূলক আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে একই লোককথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে কীভাবে নতুন রূপ লাভ করে। প্রথমে লোককথাগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক-

বাংলা লোককথা ঃ

এক রাজ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস। একদিন বিকেলে ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে বাইরে গেলেন কোন এক কাজে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ব্রাহ্মণের মনে হল একবার লুকিয়ে দেখা যাক যে তার অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণী কী করছে। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারল যে ব্রাহ্মণী রান্না ঘরে কিছু রান্না করছে। ব্রাহ্মণ লুকিয়ে তা দেখতে গেল। বাঁশের তরজার (বাঁশ দিয়ে তৈরী ঘরের দেয়াল) ফাঁক দিয়ে ব্রাহ্মণ দেখতে পেলো যে ব্রাহ্মণী পিঠে ভাজছে। ব্রাহ্মণ চুপ করে সেখানে বসে রইল এবং তেলে পিঠে ভাজার শব্দ শুনে বুঝতে পারলো যে ব্রাহ্মণী মোট পনেরটা পিঠা ভাজল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর ব্রাহ্মণী একটি পাত্রে মাত্র তিনটি পিঠা দিল। ব্রাহ্মণ তা দেখে বলল- 'ছেৎ পিঠা পনের, পাত তিন পাতিলাত বার'। অর্থাৎ পনেরটি পিঠা

বানিয়ে ব্রাহ্মণী মাত্র তিনটি পিঠা ব্রাহ্মণের পাত্রে দিয়েছে আর বারোটি পিঠা পাত্রে লুকিয়ে রেখেছে। ব্রাহ্মণী তো শুনে অবাক। ব্রাহ্মণী ভাবল যে ব্রাহ্মণ বিরাট বড় জ্যোতিষ। পরদিন ব্রাহ্মণী সমস্ত গ্রামে নিজের স্বামীর জ্যোতিষ হওয়ার ঘটনাটি রটিয়ে দিল। রটতে রটতে কথাটি গিয়ে পৌঁছল রাজার কানে। একদিন রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ তো পড়ল মহাবিপদে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণ হাজির হল রাজার দরবারে। রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন যে তিনি ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ বিদ্যার প্রশংসা শুনেছেন, তাই তার পরীক্ষা নিতে চান। ফলে ব্রাহ্মণকে রাজমহলে থাকতে হবে। রাজার কথাই তো শেষ কথা, তাই ব্রাহ্মণের এছাড়া আর কোন গতি ছিলনা। পরদিন রাজা মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণকে নিয়ে নৌবিহারে বের হলেন। নদীতে চলতে চলতে রাজা হঠাৎ ব্রাহ্মণের অলক্ষে একটি উড়ন্ত ফড়িং হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলেন এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন যে হাতের মুঠোর মধ্যে কি? ব্রাহ্মণ তখন নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে বিড়বিড় করে বলল 'ঠেকছে জোলা ফরিঙা খল'। ফরিঙ শব্দটি শুনেইরাজা ধরে নিলেন যে ব্রাহ্মণ বোধহয় তাঁরই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়েছে। রাজা খুশী হয়ে বা বা দিলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা আবার ব্রাহ্মণের অলক্ষে জল থেকে একটি 'জল সিঙ্গারা' (পানী ফল একে অনেকে শালুকও বলে) হাতের মুঠোয় নিয়ে আগের মত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। ব্রাহ্মণ তো আবার পড়ল বিপদে। ক্ষোভের সুরে ব্রাহ্মণ আবার বিড়বিড় করে বলতে লাগল 'কথায় কথায় হালুক (শালুক) নি'। সৌভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মণের এ কথা গুলিও রাজার প্রশ্নের উত্তরের সাথে মিলে যায়। এইভাবে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজার কাছ থেকে পুরষ্কার লাভ করে বাড়ি ফিরে আসেন।

কিছুদিন পর রানীর সোনার হার চুরি হয়ে যায়। রানীর হার উদ্ধারের জন্য রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ তো পড়ল মহাবিপদে। কিন্তু উপায় তো আর নেই। ব্রাহ্মণ ভাবল যে এবার তো আর রক্ষে নেই, এবার নিশ্চয় গর্দান আছে। রাজা ব্রাহ্মণকে রানীর হার উদ্ধারের জন্য তিনদিনের সময় দিল। ব্রাহ্মণের তো রাতের ঘুম উড়ে গেল। নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে শুধু ভাবতে লাগল, এ বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি? দুদিন এভাবেই

কাটল। কিন্তু কোন উপায় আর বের হল না। তাই তৃতীয়দিন নিজের জীবন ভাগ্য দেবতার হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজদরবারের উদ্দেশে রওয়ানা দিল। 'হায় বিধি হায় বিধি' বলতে বলতে ব্রাহ্মণ নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এমন সময় নদী পার থেকে এক মহিলা এসে হাত জোড় করে ব্রাহ্মণের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল 'দোহাই ঠাকুর আমাকে রক্ষা করুন। আমি রানীর হার ফিরিয়ে দেবো। আপনি দয়া করে রাজার কাছে আমার নাম বলবেন না'। ব্রাহ্মণ প্রথমে আশ্চর্য হল, কিন্তু চতুর ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সবে বুঝতে পারল। তাই মহিলাকে সবকথা খুলে বলার জন্য বলল। সবকথা শুনে ব্রাহ্মণ ওই মহিলাকে অভয় দিয়ে রানীর হারটি রাজবাড়ির পিছনদিকে গোবর গাদায় লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিল। আসলে ওই মহিলাটি রাজবাড়ির দাসী আর তার নাম বিধি। তাই ব্রাহ্মণের মুখে 'বিধি' 'বিধি' শুনে সে ভেবেছে ব্রাহ্মণ বোধহয় গণনা করে তার চুরি ধরতে পেরেছে। তাই বিপদ বুঝে ব্রাহ্মণের কাছে আত্মসমর্পণ করে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আর এদিকে ব্রাহ্মণের ভাগ্য খুলে যায়। আসলে ব্রাহ্মণ ভগবানকে স্মরণ করছিল।

প্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণ রাজদরবারে গিয়ে হাজির হল এবং রাজাকে বলল-'দামা দেখছি লেবু ঘর আর গলার হার গোবরর ছাপ (গোবরের গাদায়)'। ব্রাহ্মণের কথামতো যথাস্থানে হার পাওয়া গেল। রাজা খুশী হয়ে ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিলেন এবং রাজ জ্যোতিষীর পদে নিযুক্ত করলেন। ব্রাহ্মণ সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে লাগল।

চাকমা লোককথা-

এক গ্রামে জোলন্যা নামে এক চাষীর বাস। বাড়ির পাশেই রয়েছে তার জুম ক্ষেত। একদিন ক্ষেত থেকে ফিরে জোলন্যার মনে হল লুকিয়ে দেখে যে তার অনুপস্থিতে তার স্ত্রী কি করে। সে লুকিয়ে দেখতে পেল যে তার স্ত্রী পিঠে বানাচ্ছে। তেলে পিঠে ভাজার শব্দ শুনে জোলন্যা গুনল যে তার স্ত্রী মোট বারটি পিঠা বানিয়েছে। সে আবার ক্ষেতে ফিরে গেল। দুপুরে খাবার সময় জোলন্যার পাতে তিনটি পিঠা দিল তার স্ত্রী। তখন সে স্ত্রী কে বলল যে বারটি পিঠা বানিয়ে তার পাতে মাত্র তিনটি? স্ত্রী ত স্বামীর কথা

শুনে অবাক। সে ভাবল তার স্বামী নিশ্চয় জ্যোতিষী জানে। সেদিন থেকেই জোলন্যার স্ত্রী সমস্ত গ্রামে প্রচার করে দিল যে তার স্বামী একজন মস্ত জ্যোতিষ। খবরটি রাজার দরবার পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। এরমধ্যে একদিন রানীর হীরের আংটি চুরি হয়ে গেল। ডাক পড়ল জোলন্যার। ভয়ে ভয়ে জোলন্যা রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় তাকে নির্দেশ দেওয়া হল যে রাতে রাজবাড়িতে থাকতে হবে আর পরদিন সকালে রাজদরবারে গিয়ে গণনা করে রানীর আংটির সন্ধান দিতে হবে। জোলন্যা বুঝতে পারল যে তার মৃত্যু আসন্ন। তাই তার চোখে ঘুম নেই। এমন সময় তার চোখে পড়ল একটি ফড়িং জ্বলন্ত প্রদীপের চারদিকে ঘুরছে। এই ফড়িংকে দেখে জোলন্যার তার নিজের করুণ অবস্থার কথা মনে হল। সে বলতে লাগলো 'ফড়িঙি তোমারও মরণ নিশ্চিত। জোলন্যাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল তার পাশের ঘরেই ছিল ফিড়িঙি নামে রাজার বাড়ির এক দাসী। রানীর আংটিটা সে-ই চুরি করেছিল। তাই সে ভাবল তার চুরি ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জোলন্যার কাছে গিয়ে আংটিটি তুলে দিল আর তাকে বাঁচানোর জন্য কাকুতি মিনতি করল। জোলন্যা দাসীর কথায় রাজী হল এবং আংটিটি রাজবাড়ির পেছনে ছাই গাদায় লুকিয়ে রাখতে বলল। দাসীও তাই করল। পরদিন সকালে জোলন্যা রাজদরবারে গিয়ে গণনা করে আংটির সন্ধান দিল। আংটি পাওয়া গেলে রাজা জোলন্যাকে অনেক পুরস্কার দিল। জোলন্যা খুশীমনে বাড়ি ফিরে এল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে বাংলা এবং চাকমা লোককথার বিষয়টি প্রায় এক। যদিও চাকমা লোককথাটি অনেকটাই সংক্ষিপ্ত। যে কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, খাদ্য-পোষাক ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে তাদের প্রচলিত লোককথায়। এই গল্প দুটিতেও আমরা এধরনের পরিচয় পাই। পাশাপাশি লোককথায় প্রকাশ পায় ব্যক্তি মানুষের চিন্তা-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। তাই লোককথাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। হয়তো এ কারনেই একই লোককথার বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশে। দেখা যায় যে মূল

বিষয়টি একই থাকে শুধু স্থান ও পরিবেশ ভেদে কাঠামো বা পাত্র-পাত্রীর পরিবর্তন ঘটে। আলোচ্য লোককথা দুটিতে আমরা এ বিষয়টি লক্ষ করতে পারি। লোককথা দুটির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

সাদৃশ্য ঃ

ক) জ্যোতিষ চর্চা।
খ) স্ত্রী-র বোকামিতে স্বামীর বিপদ।
গ) ভাগ্যের সহায়তায় বিপদ থেকে রক্ষা ও পুরস্কার লাভ।
ঘ) প্রকৃতার্থে কেউ (ব্রাহ্মণ ও জোলন্যা)-ই জ্যোতিষ নয়।
ঙ) খাদ্য-পিঠা।
চ) দাসী চোর।

বৈসাদৃশ্য ঃ

	বাংলা লোককথা	চাকমা লোককথা
ক)	দরিদ্রব্রাহ্মণ।	ক) সাধারন চাষী।
খ)	পনেরটি পিঠা	খ) বারটি পিঠা।
গ)	গলার হার।	গ) হীরার আংটি।
ঘ)	গোবর গাদা থেকে উদ্ধার	ঘ) ছাই গাদা থেকে উদ্ধার।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে লোককথা দুটিতে কিছু সাদৃশ্য যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে পার্থক্যও।

লোককথার প্রধান বেশিষ্ট্য হল তার আন্তর্জাতিকতা। কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও এক আশ্চর্য মানসিক মিল রয়েছে। 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি'র উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোককথা সংগৃহীত হওয়ার পর প্রয়োজন দেখা দিল তার শ্রেণী বিন্যাসের। তখন বিখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ এণ্টি আর্নে আবিষ্কার করলেন টাইপ-ইনডেকস পদ্ধতির। আর্নের মৃত্যুর পর টাইপ মোটিফ পদ্ধতি সম্পূর্ণতা দেন স্টিথ থমসন। টাইপের সংজ্ঞায় আর্নে বলেছেন- 'A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrativeand does not depend

for itsmeanig on any other tale, but the fact that it may apCconist of only one motif. Most animal tales and jokes. Anecdotes are types of them.'[1] অর্থাৎ প্রত্যেকটি লোককথার একটি বিশেষ টাইপ থাকে এবং যার সাহায্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোককথাকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়। মটিফের সংজ্ঞায় তিনিবলেছেন- 'A motif is the smallestelement in a tale having a power it must have something unusual and striking about.'[2] অর্থাৎ প্রত্যেকটি লোককথার মধ্যে এক বা একাধিক মূল বিষয় থাকে। যার মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে তেমনি থাকে এক সার্বজনীন অভিপ্রায়। যার সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত লোককথাকে এক সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভাজিত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া লোককথার বিশ্লেষণেও টাইপ ও মটিফ ইনডেক্স পদ্ধতি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের আলোচ্য লোককথা দুটিতে আমরা দেখতে পাই যে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও এদের মধ্যে বিষয়গত ও ভাবগত এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষের সার্বজনীন অভিপ্রায়টিই ফুটে উঠেছে। বাংলা ও চাকমা লোককথা দুটির মধ্যে যে টাইপ ও মোটিফ রয়েছে তা নিম্নরুপ -

টাইপ ঃ ১৬৪১

তেলে পিঠে ভাজার শব্দ শুনে স্বামী বলে দিতে পারেন স্ত্রী কয়টি পিঠা বানিয়েছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর জ্যোতিষ অর্থাৎ গণক হওয়ার প্রচার। রাজার বাড়িতে চুরি। বিপদকালে বিধির স্মরণ আর বিধি নামে দাসী চোরের উদ্ধার। দাসীর চুরির কথা স্বীকার।

মটিফ ঃ প্রসঙ্গ

১) এন-৬১১ অকস্মাৎ দাসী চোরের আবিষ্কার। রানীর হার ও আংটি উদ্ধার। এবং গণকের কেরামতি জাহির।

২) কিউ-১ চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধারের জন্য গণককে আমন্ত্রণ ও সফলতায় পুরস্কার প্রদান।

৩) এইচ-৫০২ রাজা ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করেন।

সুতরাং, দেখা যায় যে একই লোককথা কীভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকে। পাশাপাশি আমরা আরও বুঝতে

পারি যে মানুষের শারীরিক গঠন ও পরিবেশগত পার্থক্য থাকলেও কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির আবেগময় প্রকাশে আসলে কোন পার্থক্য নেই। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোককথায় ভাবগত ও গঠনগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আমাদের এই বাংলা ও চাকমা লোককথার তুলনামূলক আলোচনায় এ বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে বলতে পারি।

❖❖❖

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১) লোকসাহিত্য-২য় খণ্ড- সিদ্দিকী, ড. আসরাফ, গতিধারা ১ম প্রকাশ, ২০০৮।

২) লোককথার সাতকাহন- চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সম্পাদিত, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১১।

৩) বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস- মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১২।

তথ্যসূত্র ঃ

১) বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেকস- মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১২, পৃষ্ঠা- ২২।

২) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৫।

লোককথা সংগ্রহ ঃ

১) পূর্ণিমা দেব, বয়স- ৫৫, শ্রীকোণা, শিলচর, আসাম।

২) চাকমা লোককথাটি নির্মল দাস সম্পাদিত "ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা" থেকে গৃহীত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হাস্যরস

- অসীম দাস

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হল মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের প্রধান তিনটি ধারা— মনসামঙ্গলকাব্য, চণ্ডীমঙ্গলকাব্য এবং ধর্মমঙ্গলকাব্য। শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্য ধারাতেই নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যগুলি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য হলেও বাস্তব জীবন এর অন্যতম উপাদান। ফলে মানব জীবনের নানাচিত্র এরমধ্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বাস্তব জীবনবোধ থেকেই হাস্যরসের উৎপত্তি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম নির্মল শুভ্র হাস্যরসের আমদানি করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন হাস্যরস অন্যান্য রস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি এক উদার এবং কৌতুক মিশ্রিত জীবনদৃষ্টি। হাস্যরসিক তাঁর রঙ্গ-রসিকতার মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দেন সমাজের নানা বৈষম্য আর অসংগতির ছবিকে। মুকুন্দরামের কাব্যে এক কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। এর আগে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এমন রংগ-রসিকতা দেখা যায় না।

মুকুন্দরাম চন্ডীমঙ্গল কাব্যে হাস্যরস পরিবেশন করেছেন 'নারীদের পতিনিন্দা' অংশে। এর মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের ঘরকন্নার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয়ের চিত্র অংকিত হয়েছে। এখানেই জীবন রসিক মুকুন্দরামের রচনার বিশিষ্টতা। কাব্যে কবি প্রথম হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন দক্ষ যজ্ঞের বর্ণনায়। যজ্ঞব্রতী ব্রাহ্মনগণ বীরভদ্র ও তার চেলা-চামুণ্ডাদের হাতে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছে তা হাস্যরস সৃষ্টি না করে পারেনা ------

'যেই জন পালায় দানাগণ ধরে তায়
পাড়িয়া উপারয়ে দাড়ি।
ছিণ্ডিল বসন ভাঙ্গিল দশন
মারিয়া স্রুবের বাড়ি।।'[১]

শিব-পার্বতীর বিবাহ উপলক্ষে কবি বেশকিছু কৌতুককর দৃশ্যের অবতারনা করেছেন। মহাদেব যেন ইচ্ছা করে ছাই-ভস্ম মেখে বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়েছেন, যা দেখে মেনকা ও পাড়া প্রতিবেশীরা বিরূপ মন্তব্য করেছেন -

'বর দেখি এয়ো সব করে কানাকানি।
চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি।।'[২]

বিবাহের পর শিব ঘর জামাই হয়ে হিমালয়ের গৃহে রয়ে গেলেন। মেনকার সংসারে টানাটানি পড়ে গেল। কন্যা পার্বতীর সাথে কথা কাটাকাটিও শুরু হল। মেনকা একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন-

'রান্ধি বাড়ি আমার কাঁকাল্যে হইল বাত।
ঘরে জামাই রাখিয়া জোগাব কত ভাত।।'[৩]

এর উত্তরে পার্বতীও মায়ের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে। এই অসঙ্গতির সুযোগেও কবি সরল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। আসলে এ চিত্র হচ্ছে হাস্যরসিক বাঙালি জীবনের এক বহু পরিচিত চিত্র। কবির জীবন অভিজ্ঞতা এই সরল হাস্যরসের সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। কালকেতুর ভোজন বর্ণনাতেও কবি হাস্যরস সৃষ্টি করে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। কবির ভাষা এখানে অতি কৌতুকপূর্ণ—

'মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ।।'[৪]

হর-গৌরীর দাম্পত্য জীবন বর্ণনায় মুকুন্দরাম দারিদ্র্যের যে ছবি এঁকেছেন, এক কথায় তা তুলনাহীন। ভাঙর, ভোলা ভিখারী মহাদেব কোনমতে ভিক্ষান্নে সংসার প্রতিপালন করেন। এহেন শিবের হঠাৎ খাদ্যরসিক হয়ে উঠা সংসারের পক্ষে কোনমতেই মংগলজনক নয়। কিন্তু বুড়োমানুষ, অবস্থা অনুযায়ী সবসময় রসনাকে সংযত রাখতে পারেন না, তাই একদিন সকাল সকাল শয্যাত্যাগ করেই গৌরীকে খাদ্যের জন্য একটি লম্বা তালিকা দিয়ে দিলেন .....

'আজি গণেশের মাতা রাধ মোর মতো
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর।
.....
ঘৃত জিরা সন্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব।।'[৫]

কিন্তু তাড়াতাড়ি স্নান করে লাভ নেই, কারণ ঘরে অভাব। তাই গৌরী স্নানে না গিয়ে হিসাব দিতে বসলেন-

'কালিকার ভিক্ষা নাথ উধার শুধিনু।
অবশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু।
রন্ধন করিতে ভালো বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই।'[৬]

ফলে শিবের সাধের আহার আর হয়ে উঠেনা। হর-গৌরীর সংসারের এই অভাব-অনটনের মধ্যেও পরোক্ষে হাস্য রস ফুটে উঠে।

চরিত্র সৃষ্টিতেও কবি হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন। যেমন- শিবের বিবাহ বর্ণনায় কবি যে রসিকতা করেছেন তাতে হাস্য সংবরন করা দুঃসাধ্য। যেমন-

'ঈষের মূলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনার মাঝে হর হইল উলঙ্গ।।'[৭]

শিবের এ অবস্থা দেখে শাশুড়ী মেনকা লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়ে যান। আর নন্দী 'নিবায় দেউটি'। অন্যদিকে ভাঁড়ু দত্ত তো সম্পূর্ণভাবেই যেন ভাঁড় চরিত্র। ভাঁড়ুর প্রথম উপস্থিতিটিই হাস্যকর-

"ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের পয়ান।
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবনে কলম খরসান।।'[৮]

ভাড়ুঁর পরিণামেও কবি পাঠককে হাসিয়েছেন-

'ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত।'[৯]

এছাড়া মুরারী শীল, দেবী চণ্ডী ইত্যাদি চরিত্রেও কবি হাস্যরস সৃষ্টির কোন সুযোগ হাতছাড়া করেননি।

সুতরাং, এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসেও কাব্যে যথেষ্ট হাস্যরসের সঞ্চার করেছেন। এর থেকে কবির রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে কবি মুকুন্দ শুধুমাত্র দুঃখের কবি নন, হাস্যরসেরও কবি।

❖❖❖

তথ্যসূত্রঃ

১. কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল- সম্পাদনা, ড° দেবেশ কুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, পৃঃ ১৫
২. তদেব, পৃঃ ২২।
৩. তদেব, পৃঃ ২৬।
৪. তদেব, পৃঃ ৪৭।
৫. তদেব, পৃঃ ২৭।
৬. তদেব, পৃঃ ২৭।
৭. তদেব, পৃঃ ২৩।
৮. তদেব, পৃঃ ৮৫।
৯. তদেব, পৃঃ ১১২।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল- সম্পাদনা, ড° দেবেশ কুমার ভট্টাচার্য, সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা।
২. শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীকামঙ্গল কাব্য, সম্পাদনা, সন্দীপ কুমার মণ্ডল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

❖❖❖

'সংস্কার' গল্প ঃ একটি বিশ্লেষণ

- শিবানী দে

জ্ঞানপীঠ বিজয়িনী মামণি রয়সম গোস্বামী অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত নাম। শুধু অসম নয় ,অসমের বাইরের বৌদ্ধিক মহলেও লেখিকা সুপরিচিতা । তাঁর রচিত 'নীলকণ্ঠী ব্রজ', 'চীনাবর স্রোত', 'মামরে ধরা তরোয়াল', 'দঁতাল হাতীর উয়ে খোয়া হাওদা' ইত্যাদি উপন্যাস ও তাঁর আত্মজীবনী 'আধালেখা দস্তাবেজ' অসমীয়া সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। উপরোক্তরচনাগুলো ছাড়াও তাঁর রচিত অসংখ্য গল্প নানা সময়ে নানা পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গল্প হলো 'সংস্কার'। এই প্রবন্ধে 'সংস্কার' গল্পের কিছু অগতানুগতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একটি সাহসী বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হওয়ায় পাঠকসমাজে গল্পটি বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর রচিত উপন্যাসের মতো তাঁর রচিত গল্পেও জগত ও জীবন সম্পর্কে এক উদার দৃষ্টিভংগী লক্ষ্য করা যায়। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিন্তাশীলতা ও জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতির ফলে মামণি রয়সম গোস্বামীর গল্পগুলো জীবন রসে ভরপূর। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই লেখিকার গল্পগুলো পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে।

দক্ষিণ কামরূপ অঞ্চলের কল্পিত কোন এক সদিলা নগর অঞ্চলের একটি গ্রামীণ পরিবেশ অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক রূপে অংকিত হয়েছে এই গল্পে। গল্পের নায়ক পীতাম্বর মহাজন সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন *"পীতাম্বৰৰ বয়স ষাঠিৰ ওচৰ চাপিছিল। এসময়ত হি হৃষ্ট-পুষ্ট পাহৰাল পুৰুষ আছিল। এতিয়া চিন্তা-ভাৱনা আৰু একধৰণৰ অসন্তুষ্টিৰ কবলত পৰি মানুহটোৰ স্বাস্থ্য পৰি আহিছিল।"* পীতাম্বর মহাজন অনেক সম্পত্তির অধিকারী হলেও সে সন্তানহীন, এটাই তার অসন্তুষ্টির কারণ। তার বংশ লোপ পেয়ে যাবে এই ভয়ে সে শংকিত। বংশ রক্ষার জন্য সে যে পথ অনুসরণ করেছে, এর একটা বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায় এই গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র পীতাম্বরের ঘরে রয়েছে

তার রুগ্ন দ্বিতীয়া স্ত্রী, রোগশয্যায় থেকে থেকে সে মৃত্যুর দিন গুনছে। তার প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর দু'মাস যেতে না যেতেই সন্তান লাভের আশায় পীতাম্বর দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। কিন্তু না, পীতাম্বর সন্তানের মুখ দেখেনি, উল্টো তার অসুস্থ স্ত্রীর হাত-পা ফুলে গেছে, বাত-পিত্ত-কফ ইত্যাদির কবলে পরে সে বিছানা আঁকড়ে পরে আছে। গুয়াহাটীর হাসপাতালে আসা যাওয়া করতে করতে পীতাম্বরের জুতো ক্ষয় হয়ে গেছে। বর্তমানে তার স্ত্রীর অস্থি-চর্মই বাকী আছে। বিছানাতে শুয়ে শুয়ে সে পীতাম্বরের গতিবিধি লক্ষ্য করে। পীতাম্বর ওকে আর হাসপাতালে নিয়ে যায় না। গ্রামের লোকের অনুমান বিছানাতে অস্থি-চর্মসার কংকালসদৃশ দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য পীতাম্বর অপেক্ষা করছে। রুগ্ন স্ত্রী বিছানায় শুয়ে থাকলেও *"তাইৰ চকু দুটা ট ট কৈ জ্বলি আছিল। কৃষ্ণকান্তই পীতাম্বৰক কি ক'ব বিচাৰিছে এই কথা জানিবলৈ তাই যেন উত্ৰাৱল হৈ আছে। দূৰৈৰ পৰা অহা দৃষ্টিও যে এনেধৰণে তীক্ষ্ণ, হৃদয়স্পৰ্শী হ'ব পাৰে এই কথা কৃষ্ণকান্তই আগে পিছে গম পোৱা নাছিল।"* কৃষ্ণকান্তর সঙ্গে কথা বলে উঠে পীতাম্বর কৃষ্ণকান্তকে টাকা-পয়সা দেয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব দেখে তার রুগ্ন স্ত্রী। আকারে ইংগিতে সুকৌশলে লেখিকা পীতাম্বরের স্ত্রীর চরিত্রটি অংকণ করেছেন, তার নীরব চাহনিতেই তার মুখের ভাষা, তার মনের ভাবকে ব্যক্ত করেছেন। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে লেখিকা তার মনের দুঃখ, শারীরিক কষ্টের ছবি অংকন করেছেন। লেখিকার একটা মানব দরদী ও সংবেদনশীল মন এই চরিত্রটিতে ধরা পরে। দময়ন্তীকে পাবার নেশায় পীতাম্বর কখনো কখনো ভুলে গিয়ে কখনো বা ইচ্ছা করেই স্ত্রীকে ঔষধ দেয় না। অবশেষে যখন দময়ন্তীর কাছ থেকে সম্মতিসূচক ইংগিত পেলো, তখন রুগ্ন স্ত্রীর থাকার জায়গা হল বাড়ীর গোয়ালঘর, যে ঘরে শুধু চাল রয়েছে, বেড়া নেই। রুগ্ন স্ত্রীর প্রতি এই ক্রুর আচরণের কারণ সে সন্তানহীনা, চিররুগ্ন। পীতাম্বর ও কৃষ্ণকান্তের কথোপকথন গল্পে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। এর ফলে এই দুটো চরিত্রকে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু সংলাপ ছাড়াই পীতাম্বরের রুগ্ন স্ত্রীর চরিত্রটিও জীবন্ত। গল্পে অংকিত প্রতিটি চরিত্রই গল্পের স্বল্প পরিসরেও পূর্ণ বিকশিত।

স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা দেখে বংশ রক্ষার কথা ভেবে আকুল হয় পীতাম্বর মহাজন। এই পরিস্থিতিতে যেন স্বর্গের দূত হয়ে তার কাছে আসে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত সেই গ্রামের এক পুরোহিত। তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখিকা লিখেছেন *"কৃষ্ণকান্তৰ সন্মুখৰ দুটা দাঁতহে বাকী আছিল। ফলত গাল দুখন একেবাৰে খাল হৈ গৈছিল। কথা কওঁতে মুখখনে এটা বিচিত্ৰ ভংগী ধাৰণ কৰিছিল। চকু দুটাত অহৰহ এটা ধূৰ্ত চাৱনিয়ে তিৰবিৰাই আছিল। মূৰৰ চুলি পাতল হৈ গৈ মূৰৰ তালু স্পষ্ট কৰি পেলাইছিল। সোঁমাজতে সেওঁতা ফলা বাবে তেওঁৰ ধূৰ্ত চকুযোৰ যেন আৰু স্পষ্ট হৈ উঠিছিল।"* কৃষ্ণকান্ত পীতাম্বরের মনের কথা জানে, তাই সে টাকা-পয়সা আদায়ের লোভে গ্রামের শম্ভু পুরোহিতের বিধবা স্ত্রী দময়ন্তীকে পীতাম্বরের সন্তান ধারণ করার জন্য অনুরোধ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামীর মৃত্যুর পর দময়ন্তীকে অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থার সন্মুখীন হতে হয়, তাই সে দেহ বিক্রী করতে বাধ্য হয়। তবে যাকে তাকে নয়, চতরাগুরি থেকে চারিআলির কলেজে পড়তে আসা ব্রাহ্মণের ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। দময়ন্তীর জৈবিক জীবনের যে চিত্র লেখিকা এখানে অংকণ করেছেন তাতে মনে হয় পরম্পরাগত উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকেই লেখিকা এখানে বিদ্রূপ করেছেন। তবে পাপ পথে নামলেও দময়ন্তী কৃষ্ণকান্তের প্রস্তাবে গর্জে উঠে, *"বেটা শূদ্ৰীয়া মহাজনৰ ইমান সাহ, সি বেটাই নাজানেনে মই যজমানী বামুনৰ আপী বুলি।"* যাইহোক, কৃষ্ণকান্ত তাকে শান্তভাবে বোঝায়। সে জানে যদি দময়ন্তী কৃষ্ণকান্তের প্রস্তাব মানে তাহলে দময়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের নিজের ঝুলিও ভরবে। অবশেষে দময়ন্তী পীতাম্বরের প্রস্তাব মেনে নেয়, কারণ সে এটাও বুঝতে পারে, *"আজিকালি গাটোও ভাল লাগি নাথাকে। কাৰোবাৰ গাত ভেজা দি থাকিব পাৰিলে ভালেই হব।"* অন্যান্য গ্রামের ব্রাহ্মণের ছেলেরা তার বাড়ীতে আসা যাওয়া করে, গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে সব কথা জেনে যাচ্ছে। এই অংশে লেখিকা দেখিয়েছেন পরম্পরার দ্বারা আচ্ছন্ন সমাজের ব্যভিচারী ও কদর্য রূপ।

তীব্র সমাজ সচেতনতা সম্পন্ন এই কলা-কুশলী শিল্পী নারী মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পুরুষের মনস্তাত্বিক অবস্থার চিত্রও নিপুণ হস্তে অংকণ

করেছেন। দারিদ্র্যের কবলে পরে কলংকিত জীবন যাপন করা ব্রাহ্মণের বিধবা স্ত্রী দময়ন্তীর সঙ্গে বংশরক্ষার খ্যাতিরে পীতাম্বর অবৈধ সম্পর্কে গড়ে তুলে। যথাসময়ে সে জানতেও পারে যে সে পিতা হতে চলেছে। সন্তান লাভের আশায় সে স্বপ্ন ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। দময়ন্তীর গর্ভে স্থিত তার সন্তানটি যেন জন্ম হওয়ার আগেই শৈশব, কৈশোর পার হয়ে তরুণ যুবকে পরিণত হয়। সোণালী ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর হয় মহাজন, সে দেখে যুবকটি ধনেশ্বরী নদীর পারে পারে মহাজনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্তান লাভের উগ্র বাসনা পীতাম্বরকে মানসিক বিকারগ্রস্ত করে তুলে।

পীতাম্বর দময়ন্তী ও কৃষ্ণকান্তের পেছনে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে। সন্তান লাভ তথা বংশরক্ষা- এই দুই চিন্তায় মশগুল পীতাম্বর কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়ায়। অপরদিকে আর্থিক দূরবস্থার জন্য পাপ পথ ধরলেও দময়ন্তী পীতাম্বরের সন্তানের জন্ম দেয় না। এর পেছনে কাজ করে তার মনের মধ্যযুগীয় মানসিকতা। বিপথে গেলেও সে পরম্পরার দ্বারা পরিচালিত। সে জানে পীতাম্বরের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয় তাহলে তার আর্থিক দুরবস্থা ঘুচবে, কিন্তু তার মধ্যে থাকা চিরন্তন সংস্কারকে সে ভুলতে পারেনা। তার সংস্কার তাকে মনে করিয়ে দেয় যে সে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় যজমানী ব্রাহ্মণের কন্যা। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই সে পীতাম্বরের প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। আর্থিক দূরবস্থার কথা ভেবে কৃষ্ণকান্তের মাধ্যমে এবং টাকা পয়সা লেনদেনের পর পীতাম্বরের সঙ্গে দময়ন্তীর সম্পর্ক স্থাপন হয়। এর পর সে সন্তান সম্ভবা হয়, তিনমাস পার হয়ে যায় কিন্তু সংস্কারের বশবর্তী দময়ন্তী পীতাম্বরের সন্তানটিকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয়না। অন্ধসংস্কার মানুষকে কিভাবে নৃশংসতার পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে পারে এর একটি মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যায় এই সমস্ত ঘটনাবলীর মাধ্যমে। দুই ধরণের সংস্কারকে লেখিকা এই গল্পের মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ পীতাম্বরের মাধ্যমে মানুষের মনে বংশরক্ষার প্রতি থাকা এক চিরন্তন সংস্কারের কথা, দ্বিতীয়তঃ দময়ন্তীর যজমানী ব্রাহ্মণের স্ত্রী বা কন্যা হিসাবে থাকা সংস্কার, এই দুই ধরণের সংস্কার এই গল্পের নামকরণের পেছনেও কাজ করছে। গল্পের উপযোগী ভাষা প্রয়োগ

তথা পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর গল্প হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত।

রামায়ণী সাহিত্যের সফল গবেষক তথা অসমীয়া সাহিত্যের সাহসী ও প্রগতিশীল ভাবধারার লেখিকা মামনি রয়সম গোস্বামীর বলিষ্ঠ রচনাভঙ্গীর এক উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায় 'সংস্কার' গল্পে। পুরুষের মনস্তাত্বিক চেতনাকে ফুটিয়ে তোলার এক নিপুন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় পীতাম্বর চরিত্রে। নতুন পটভূমি, নতুন বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে কাহিনীকে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছেন লেখিকা। এই গল্পে গ্রামের মানুষের সহজ সরল ছবি অংকণ করা লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল সে সমস্ত মানুষের কামনা-বাসনা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কার জর্জরিত এক ভয়ানক ছবি, যার প্রতিফলন হয়েছে এই গল্পে। দারিদ্র্যের তাড়নায় বিপথে যাওয়া দময়ন্তী এবং তার কু-কর্মের কথা নিয়ে রচিত হলেও বংশ রক্ষা বলে চিরন্তন সংস্কারটিকেই লেখিকা এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু করে তুলে ধরেছেন। তাই গল্পের কদর্য অংশকে ছাপিয়ে উঠেছে গল্পটির সাহিত্যিক মূল্য এবং অবশ্যই মানবজাতির চিরন্তন একটি আকাংখা। বিরল সাহসী প্রতিভার অধিকারী এই লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অনেক অভিজ্ঞতায় নিজেকে পুষ্ট করেছেন, তার কিশোর বেলার স্কুলের ছাত্রী জীবনের এক বান্ধবী ছবি গুপ্তার একটি লেখাতেই শিলং থাকাকালীন লেখিকার বিডন-বিশপ ফল্‌স্ দেখতে যাওয়ার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা জানা যায়। যদিও শেষে বড়দের হস্তক্ষেপে অভিযানটি সফল হয়নি। (দ্রঃ ২৯/১০/১৩ দৈনিক যুগশংখ পত্রিকা) তাঁর দুঃসাহসিক মনোভাব ব্যক্তিগত জীবনের মতো তাঁর সাহিত্যেও প্রতিফলিত।

❖❖❖

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। মামণি রয়সম গোস্বামীর প্রিয় গল্প, সম্পাদক ডঃ প্রফুল্ল কটকী, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটী।

২। গল্পর প্রসঙ্গ আরু অসমীয়া গল্প সাহিত্য, ডঃ পরাগ কুমার ভট্টাচার্য্য, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটী।

৩। অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী (ষষ্ঠ খণ্ড), সম্পাদক হোমেন বরগোহাঞি, আনন্দরাম বরুয়া ভাষা-কলা-সংস্কৃতি সংস্থা।

৪। আধুনিক অসমীয়া উপন্যাসর শিল্পরীতি, ডঃ প্রদীপ কুমার বরুয়া, শব্দ প্রকাশ, যোরহাট।

৫। অসমীয়া উপন্যাসর গতি-প্রকৃতি, সম্পাদনা শৈলেন ভরালী, সাহিত্য অকাদেমী।

❖❖❖

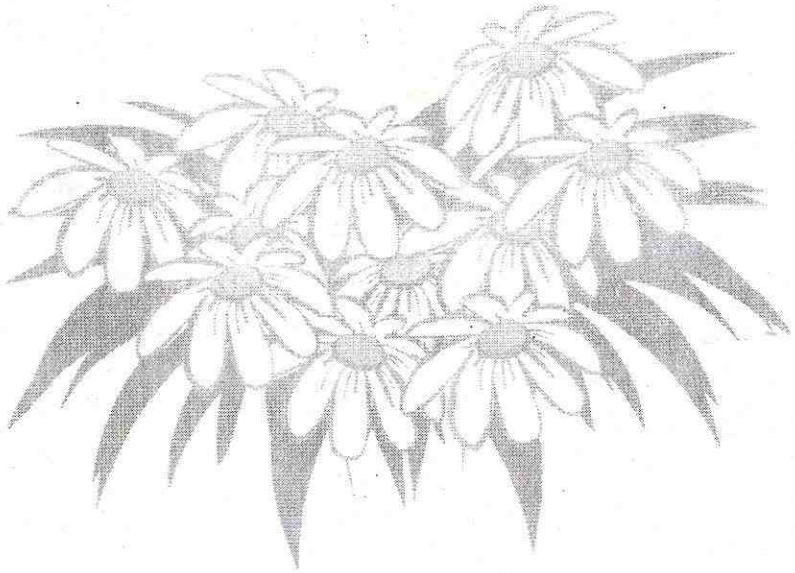

প্ল্যানচেট

- সৌমাঞ্জলি বাগচী

সারাদিন ধরে ঝিরঝির করে একনাগাড়ে বৃষ্টি পড়েই চলছে। দুঘণ্টা ধরে লোডশেডিং। তিন বন্ধু- তপন, সুরেশ আর প্রসূন একটা অন্ধকার ঘরে বসে গল্প করছিল, সামনের রাস্তাটাও কিছু দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরটিতে বসে আসলে তিন বন্ধু মিলে প্ল্যানচেট করছিল। এতক্ষণ ধরে বসার পরও যখন কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিল না, তখন ওরা হতাশ হয়ে পড়ল। তপন বললো, "একটা কেণ্ডেল জ্বালা, আজকের এই সিটিংটাই ব্যর্থ হলো, অন্ধকারে চোখ কানা হয়ে গেল।" সুরেশ অনেক খুঁজে খুঁজে একটি আধজ্বলা মোম জ্বালালো। তখন হঠাৎ তপন বললো, "কে যেন মনে হচ্ছে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, ঐ সুরেশ শুনতে পাচ্ছিস"?

অবাক হয়ে তিনজন দেখল, দরজার বাইরে আবছা আবছা কাকে যেন দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভিতর থেকে তপন বলল, "কে দরজার বাইরে?" বাইরে থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ এলো, "আমি বিকাশ"। তপন সংগে সংগে দরজাটা খুলে বললো, "আরে বিকাশ, তুই এখানে এতো বৃষ্টির মধ্যে কি করে এলি? তোর শরীরে এতো কাঁদা কেন? তোর মাথা ফাটলো কি করে?" তপন এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো প্রশ্ন করার পর বিকাশ বললো, "আরে, আমাকে আগে ভিতরে আসতে দে, তারপর সব বলছি," একটু থেমে বিকাশ বললো, "আমার এখানে আসার একদম ইচ্ছা ছিল না কিন্তু একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এলো।" অবাক হয়ে সুরেশ বলে উঠলো, "প্রচণ্ড শক্তি মানে?" উত্তরে বিকাশ বললো, "মনে হলো প্রসূন যেন আমাকে ডাকছে, ... তপন কাগজ কলমটা নিয়ে আয়, আর দেরী করিস না।" এসব শুনে ওরা তিনজনে অবাক হয়ে রক্তে রাঙা বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। প্রসূনের তখন হঠাৎ করে মনে পড়লো, প্ল্যানচেট করার সময় প্রসূন যখন তার মৃত বড় দিদিকে মনে

করার চেষ্টা করছিল তখন তার মনে বারবার ভেসে আসছিল বিকাশের মুখ। প্রসূন এসব ভাবছে... হঠাৎ করে মোমটা নিভে গেল..... ঠিক তখনই শোনা গেল বিকাশের কথা..... "ভালই হলো", সংগে সংগে তপন বললো, "ভালই হলো, মানে"? তখন বিকাশ বললো, "মোমের আলোটা খুব চোখে লাগছিল" বিকাশের কথার সুরে তিন বন্ধুর শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলো..... কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। নিঃশব্দ ঘরে একটু সাহস গুটিয়ে তপন আর সুরেশ দুইজনে একসংগে ডেকে উঠলো, "বিকাশ, বিকাশ, তুই কোথায়?" কোন সাড়া শব্দ নেই, কিন্তু সকলের মনে হলো বিকাশ যেন একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট গলায় দূর থেকে বলছে, "আমি যাচ্ছিরে...." বন্ধ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগলো। সংগে সংগে লাইটগুলো জ্বলে উঠলো, সুরেশ দৌড়ে দরজার কাছে এলো, এসে দেখলো রাস্তায় এক হাঁটু জল, আর সেই জলের উপর দিয়ে কে যেন হেটে চলে যাচ্ছে।

পরের দিন সকালে খবরের কাগজে ওরা জানতে পারলো যে বেলগাছিয়ার কাছাকাছি কোন এক অঞ্চলে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকাল রাতের প্রচণ্ড ঝড়ের সময়, ব্রীজের রেলিং ভেঙ্গে বাস অনেক নীচে পড়েছে, তাতে বাসের প্রায় সমস্ত যাত্রী নিহত, তাদের মধ্যে বিকাশ একজন।

মর্গে ছিল ডেডবডিগুলো। ওরা তিনজন বিকাশকে দেখতে গেল..... অবাক হয়ে ওরা দেখল, গতকাল বৃষ্টির রাতে যখন বিকাশ ওদের সংগে দেখা করতে এসেছিল তখন সে যে শার্ট পরা ছিল এখনও সেই শার্টটাই পরা, সেই কাদা মাখানো শরীর আর ফাটা মাথা থেকে রক্ত বেরিয়ে গালে মুখে কালো কালো ছোপ.....

এরপর আর কোনদিন ওরা প্ল্যানচেট করতে বসেনি।

❖❖❖

ক্রন্দন রোধের ক্রন্দন

- নীলিমা গোস্বামী শর্মা

পথের ওপারে
ঠাকুর ঘরে
তারা দিচ্ছে
ভক্তির মলয় বাতাস

ওপার থেকে
আমি শুনেছি
একটি রসভরা
রিণি রিণি
সর্বকালের
ক্রন্দন রোধের ক্রন্দন।

❖❖❖❖❖

কাগজ পেলেই কবিতা লিখতে পারি না

- নীলিমা গোস্বামী শর্মা

অবনীদা বলার মত
এখন আর
কাগজ পেলেই কবিতা লিখতে পারিনা

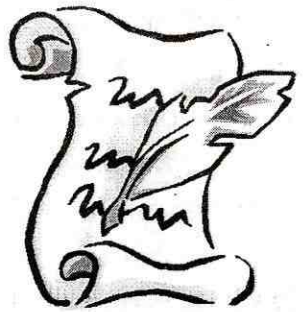

হাতে হাতে মশাল নিয়ে যখন
সমদল এগিয়ে যায়
ধেমাজির বুক কাঁপে
মহানগরীতে .....

❖❖❖❖❖

বিচিত্র নগরী

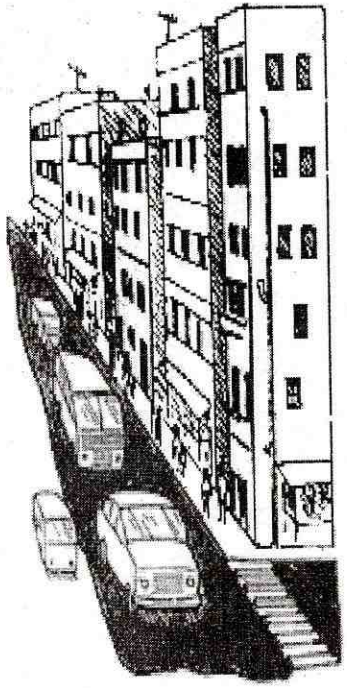

-পমি দে

এ কোন নগরে এলাম আমি.....
কি বিচিত্র, ভয়ানক ও বাজে চেহারা তার,
চারিদিকে ছড়ানো পঁচা গলা দেহ কার।
জীবিতদের কান্না চেঁচামেচি চিৎকার,
মাটির রং যেন সবসময় লাল এখানকার।
আকাশ নীল নয়, ধোঁয়াটে এখানে,
পৃথিবীর রং বদলে দিয়েছে মিলে সব শয়তানে।
এখানে মরে নির্ভয়া, সুস্মিতা আরো কত কে,
জানা অজানা আরো কত তার হিসাব রাখে কে?
ভুলে যেতে চাই সব দুঃখ কষ্ট ব্যথা,
মানুষ মানুষের মাঝে নিয়ে আসুক শান্তির বার্তা।

❖❖❖❖❖

শরতের আকাশ

- চন্দ্রমোহন কলিতা

শরতের নীল আকাশের নীচে
কাশফুলগুলো দুলছে,
নদীর ধারের কাশবনগুলি
দুলে দুলে যেন হাসছে।
মানুষের মনে জাগছে এক
মনোরম অনুভূতি,
তূলো ভরা নীল আকাশ,
বয়ে যাচ্ছে মলয় বাতাস,
প্রিয় শারদীয় প্রকৃতি।

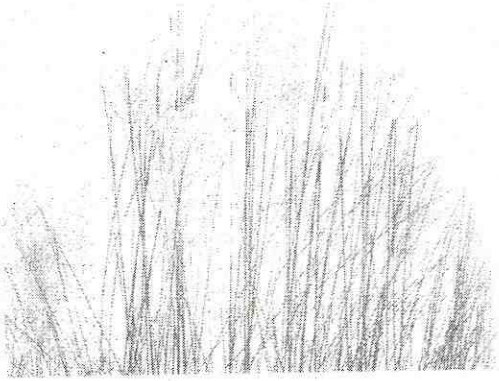

❖❖❖❖❖

শাওন

- আবুল কাসেম তপাদার

তোরই লাগি সাধ পুরালো
পাতার পর পাতা লিখে,
তোর সুরে গান রচিতে
রচিল রিমঝিম সুরে,
প্রবল শাওনের একলা রাতে
কোমল চন্দ্রিমার মুখে ছাই মেখে
আনলো বারিষ ঝরঝরে
কাগজের প্রসূণ সাজিয়ে
তারই মাঝে গন্ধ খোঁজে পাগল নয়ন,
মিছে কী শোভা খোঁজে
মনে পায় কী সান্ত্বনা সে যে ।
সারা সন্ধ্যা কোন সন্ধ্যার স্বাদ নিলো
মরিলো কোন বসন্তে হারিয়ে গেল তায়,
দমকা হাওয়ায় বুকের মাঝে আসিলো যেন জোয়ার,
ঝরিলো আকাশ ভেঙ্গে দেনা পাওনার হিসাব
বর্ষিলো ঝরঝর সরগমে শ্রাবণের নিঝুম রাতে।

❖❖❖❖❖

মায়ের মন

- শিবানী দে

ঐ পাহাড়ের দেশ,
দেখতে লাগে বেশ
দিনের বেলায় আলো,
রাত্তিরেতে কালো।

সূয্যি মামা সকাল বেলা,
করছে না তো কাউকে হেলা।
গাছগুলোকে দিচ্ছে আলো,
ঘন, সবুজ যেন কালো।

পাখির ডাকে সবাই জাগে,
মা জাগে ছেলের আগে।
সূয্যি মামা মাথার উপর,
এখন সময় ভর দুপুর ।

একটু পরে হলো বিকেল,
সবাই যে যার বাড়িতে চল।
গাছে পাখির কিচির-মিচির,
মায়ের মনটা হচ্ছে অধীর।

ছেলে গেছে বনের মাঝে,
এখনো সে ফিরছে না যে।
চিন্তা নিয়ে তুলসী তলায়,
মা সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালায়।

একটু পরেই ছেলে ফিরলো,
মায়ের চিন্তা দূর হলো।
ছেলে বলল, ঐ পাহাড়ে
বড় বড় গাছ,
অনেক অনেক ফল মাগো
ধরে বারো মাস।
নানা জাতের ফুলগুলো
করছে পাহাড় আলো,
তাড়াতাড়ি কি করে
ঘরে ফিরি বলো।
খেলা সেরে তোমার তরে,
কুল এনেছি দুহাত ভরে।
ছেলের মুখের মিষ্টি হাসি,
আনন্দে যায় হৃদয় ভাসি।
মা ছেলেতে মিলন হলো,
স্বর্গসুখ আর কোথায় বলো।

❖❖❖❖❖

পাখির কথা

- মমতা দাস

কোনোদিন কোনোখানে
এই সুন্দর পৃথিবীতে
যদি পাও আমার দেখা.....
উড়ে যাব আবার
জানি না কোথায়,
কোনদিকে কোনপ্রান্তে,
থেকে যাবে আমার চিহ্নরেখা।
জানি যাব চলে ,
তবু বলি আমার কথা,
আসিব আবার ফিরে,
এই সুন্দর পৃথিবীতে।
আবার উড়ে যাব,
সব কিছু ভুলে,
এই সুন্দর নীল আকাশের তীরে।।

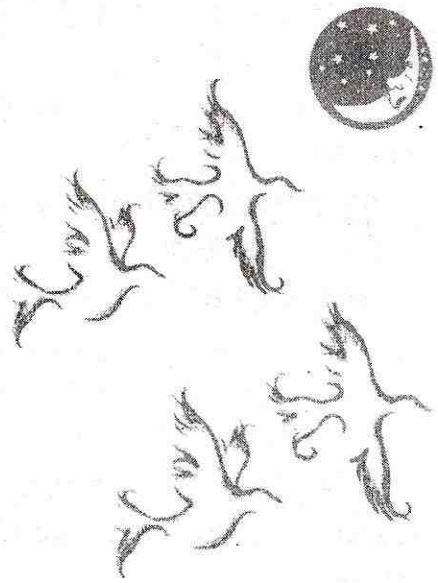

❖❖❖❖❖

প্রণাম জানাই

- সীমা দে

হে ভগবান,
এসেছি ধরায়,
জননী আমার,
স্নেহের বাধঁনে,
হে শিক্ষাগুরু,
তোমার হাত ধরে,
করু ণানিধান ।
তোমার কৃপায়।
স্নেহের আধার ।
রেখেছো যতনে ।
করেছি শিক্ষা শুরু ।
নিচ্ছি জ্ঞান ভরে ।

❖❖❖❖❖

জান কি?

ক) পৃথিবীর কোথায় এবং কবে প্রথম পাতালরেল চলানো শুরু হয়?
উঃ ১৮৬৩ সালে লণ্ডনে প্রথম পাতালরেল চলানো শুরু হয় ।

খ) পঞ্চভূত কী কী?
উঃ পঞ্চভূত ঃ ক্ষিতি - ভূমি, অপ - জল, তেজ - আগুন, মরুৎ - বাতাস এবং ব্যোম - আকাশ।

গ) আট সেপ্টেম্বর দিনটি কি দিবস হিসাবে পালন করা হয়?
উঃ বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস।

ঘ) দ্রোণাচার্য পুরস্কার কাকে দেওয়া হয়?
উঃ খলায় যাঁরা কোচ হিসাবে খেলোয়ারদের প্রশিক্ষণ দেন তাদের সম্মান জানানোর জন্য দ্রোণাচার্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

ঙ) প্রথম কোন মহিলা ঔপন্যাসিক দু'বার বুকার পুরস্কার লাভ করেন?
উ ঃ বৃটিশ লেখিকা হিলারি ম্যানটেল।

চ) প্রাচীন সিকিমের রাজধানীর নাম কী?
উ ঃ প্রাচীন সিকিমের রাজধানীর নাম 'ইয়কসাম'।

ছ) বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ও লেখক সত্যজিৎ রায়ের পিতার নাম কী?
উ ঃ সুকুমার রায়।

জ) আই এস আই সংক্ষিপ্ত কথাটির পূর্ণরূপ কী?
উ ঃ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্স ইনষ্টিটিউশন। আবার এর দ্বারা ইন্টার সার্ভিসের ইন্টেলিজেন্সও বোঝায়।

ঝ) বারোয়ারি দুর্গা পূজার কথা অনেক সময়ই শোনা যায়। এই বারোয়ারি শব্দটি দুর্গা পূজার সঙ্গে কীভাবে মিশে গেছে? কবে প্রথম বারোয়ারি দুর্গা পূজা করা হয়?
উ ঃ হুগুলির গুপ্তি পাড়ার কোনও একটি বনেদি বাড়ির দুর্গা পূজায় অংশগ্রহণ করতে না পেরে বারো জন বন্ধু অর্থাৎ ইয়ার মিলে ১৭৬১ সালে প্রথম যে দুর্গাপূজাটি করেছিলেন তখন থেকেই বারোয়ারি শব্দটি দুর্গা পূজার সঙ্গে মিশে গেছে।

লেখক পরিচিতি ঃ

রঞ্জনা সেন	ঃ সহযোগী অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ।
নীলিমা গোস্বামী শর্মা	ঃ সহযোগী অধ্যাপিকা ও কবি, অসমীয়া বিভাগ।
চন্দ্রমোহন কলিতা	ঃ সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ।
হীরাবালা দাস	ঃ সহকারী অধ্যাপিকা, হিন্দি বিভাগ।
শিবানী দে	ঃ বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ।
সূর্য্যসেন দেব	ঃ সহকারী বিভাগ, বাংলা বিভাগ।
অসীম দাস	ঃ স্নাতক ৩য় ষান্মাসিক, বাংলা সাম্মানিক।
সৌমাঞ্জলি বাগচি	ঃ স্নাতক ১ম ষান্মাসিক, বাংলা সাম্মানিক।
মমতা দাস	ঃ স্নাতক ১ম ষান্মাসিক, বাংলা সাম্মানিক।
পমী দে	ঃ স্নাতক ১ম ষান্মাসিক, বাংলা সাম্মানিক।
আবুল কাসিম তপাদার	ঃ প্রাক্তন ছাত্র।

❖❖❖

মজার ধাঁধাঁ

১। দশ শির আছে তার নয় তো রাবণ,
রমণীর হাতে তার অবশ্য মরণ।

২। তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে,
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে আকাশেতে উড়ে।

৩। তিন বর্ণের নামটি আমার আরাম করে শুই,
প্রথম বর্ণ কেটে দিলে দুধের থেকে হই।
মাঝের বর্ণ কেটে দিলে ছাড়া পেয়ে যাই,
শেষের বর্ণ কেটে দিলে ভীষণ ভয় পাই। ❑

(উত্তর ৩২ পাতায়)

বিভাগীয় সংবাদ ঃ ২০১৩

—বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে চলতি বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস পালন করা হয়।

— মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্রাচীর পত্রিকা প্রতিযোগিতায় বাংলা ও হিন্দি বিভাগ যৌথভাবে অংশগ্রহন করে এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

— বাংলা ও হিন্দি বিভাগ যৌথভাবে ৮ ই নভেম্বর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে। চন্দ্রপুরের নিকটবর্তী পবিতরা অভয়ারণ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়।

— গত শিক্ষাবর্ষের স্নাতক বাংলা সান্মানিকের ছাত্রী চম্পা পাল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তার এই কৃতিত্বের জন্য বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

❖❖❖

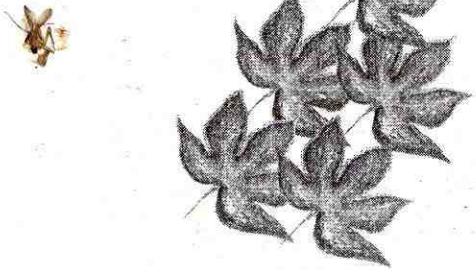

উত্তর ঃ চিরুণী, বৃদ্ধাংগুষ্ঠ, কলসী, আনারস।
উত্তর ঃ ঝিংগা, চিতল, বিছানা।

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন, ২০১৩

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন, ২০১৩

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন, ২০১৩ সাল

শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ২০১৩